১৮ জুলাই ঘোষণা করা হোক ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিরোধ দিবস’

ছবি-সংগৃহীত

শাহেরীন আরাফাত

প্রকাশ: ১৮ জুলাই ২০২৫ | ১৪:২২

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতি মূলত অনুপস্থিতই ছিল—কারণ স্বাধীনতা-পরবর্তী দীর্ঘ সময় দেশে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল না। তবে ২০০৭-এর সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন, ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দেখা গেলেও তারা সেখানে খুব একটা অগ্রগামী অবস্থানে ছিলেন না। কিন্তু ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান

–বাংলাদেশের সমসাময়িক ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মোড়–সেই বাস্তবতা পাল্টে দিয়েছে। এ আন্দোলনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শুধু সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি; বরং প্রতিরোধের ব্যাটন তুলে নিয়েছিলেন। ১৮ জুলাই, যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস ফাঁকা করে দেওয়া হয়, তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই আন্দোলনে নতুন মাত্রা জারি রাখেন। সেদিনই প্রথম কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদ হন। এরপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৩০ জন শিক্ষার্থী শহীদ হয়েছেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য ও শ্রমবাজারে বেকারত্বের বাস্তবতা

দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩টি এবং বেসরকারি ১১৬টি, যার মধ্যে ১০৭টিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। অথচ এই বিশাল উচ্চশিক্ষা কাঠামো সমাজকে যে মৌলিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও মানবিক নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল, তা আজ একটি চাকরিপ্রার্থী–হতাশ, দিশাহারা প্রজন্মে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি বছর ২০ থেকে ২২ লাখ তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ-২০২৩ থেকে জানা যায়, ১৮ কোটি মানুষের বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬৩ লাখই বেকার। আর এই বেকারদের ৮৭ শতাংশই শিক্ষিত বেকার। আর ২১ শতাংশ বেকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েও কোনো কাজে যুক্ত নন।

একটি ভয়াবহ পরিসংখ্যান হলো, সরকারি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়োগের হার ০.০০০৭৪ শতাংশ। এর ফলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, নীতিনির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিসরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কার্যত অনুপস্থিত। বেসরকারি চাকরির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অভাব; অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিকভাবে পাবলিক-বেসরকারি বৈষম্য, সর্বোপরি ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমে ওঠা ক্ষোভ ২০২৪ সালে এক বিশাল বিস্ফোরণে রূপ নেয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক উত্তরণ

২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয় জুনের প্রথম দিকে। এরপর আল্টিমেটাম অনুযায়ী জুনের শেষ অবধি কোনো সংস্কার প্রক্রিয়া না এগোলে ১ জুলাই 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে আন্দোলন শুরু হয়। ৭ জুলাই 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির মাধ্যমে এটি জেলা-উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে আন্দোলন দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ জুলাই রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়।

১৭ জুলাই মহররম উপলক্ষে কর্মসূচি স্থগিত থাকলেও গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। আর এতে বাধা ও হামলার ঘটনা ঘটে। তৎকালীন সরকার অনৈতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল বন্ধ ঘোষণা করে এবং রাতের আঁধারে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করতে চায়। তখন কার্যত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্তব্ধ করার মধ্য দিয়ে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ১৮ জুলাই সব পূর্বাভাস ভুল প্রমাণ করে, ঢাকার রাজপথ উত্তাল করে তোলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মিছিল।

নর্থ সাউথ, ব্র্যাক, ইস্ট ওয়েস্ট, ইউআইইউ, ড্যাফোডিল, ইউল্যাব, ইউডা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল, প্রাইম এশিয়া, ইউআইটিএসসহ অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী নতুন বাজার, রামপুরা, উত্তরা, বাড্ডা, ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুরসহ ঢাকার উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের প্রধান সড়কগুলো দখলে নেয়। পরিণতিতে ঢাকার কূটনৈতিক অঞ্চল কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকায় বিজিসি ট্রাস্ট ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম; রাজশাহীতে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়; খুলনায় নর্দান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে।
এই দিন পুলিশের গুলিতে নিহত হন অন্তত ৬ জন, আহত হন শত শত। রামপুরায় পুলিশের গুলিতে শিক্ষার্থী শহীদ হওয়ার পর পুলিশ নিজেরাই গুলি শেষ হয়ে গেলে এক পর্যায়ে পাশের ভবনের ছাদে আশ্রয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চায় এবং হেলিকপ্টারে পালিয়ে যায়–যা রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা।

সেদিন সকাল ১১টার দিকে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আসিফ হাসান শহীদ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় শহীদ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শহীদ। পরবর্তী আন্দোলনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বরাবরই আন্দোলনে সক্রিয় থেকেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৩০ জন শহীদ হন।

১৮ জুলাইয়ের প্রতিরোধের পর সরকার বিপর্যস্ত হয়ে ২১ জুলাই নতুন নিয়োগ পরিপত্র জারি করে। তবে ততদিনে শহীদের সংখ্যা কয়েক শ। শিক্ষার্থীদের দাবি পরিষ্কার; এত মানুষ মারার বিচার করতে হবে! দাবিতে অনড় থাকলে ২৬ জুলাই থেকে সরকার দেশজুড়ে দমন শুরু করে। বিশেষ করে গুলশান এলাকার তিনটি থানা–বাড্ডা, গুলশান ও ভাটারায়–যেখানে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত, সেখানেই সর্বোচ্চ সংখ্যক গণগ্রেফতার হয়।

শিক্ষার্থীরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে রাতের পর রাত বাসায় ফিরতে পারেনি, দিনের পর দিন পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, মোবাইলের ছবি মুছে জুতোয় আইডি কার্ড লুকিয়ে পথে নামতে হয়েছে। তাদের অপরাধ? তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং তারা এই দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার দাবি জানাতে চেয়েছেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের ভূমিকা

যদিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ এবং শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের চাপের মধ্যে থাকেন; তবুও চব্বিশের আন্দোলনে নর্থ সাউথ, ব্র্যাক, ইউল্যাব, সাউথইস্ট, খুলনার নর্দান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মানববন্ধন ও বিবৃতি দিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। বিশেষভাবে 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক'-এর ব্যানারে পাবলিক-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষকরা আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

১৮ জুলাই: এক ঐতিহাসিক দিন

আন্দোলনের বিবরণ, শহীদের সংখ্যা, রাজনৈতিক পটভূমি ও নেতৃত্বের গতিপথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়–১৮ জুলাই-ই ছিল সেই দিন, যেদিন ছাত্র আন্দোলনের মূল দায়ভার তুলে নিয়েছিল দেশের কথিত অরাজনৈতিক, সমাজ সচেতনতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত; তবে চেতনায় দীপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তাদের রক্ত, প্রতিরোধ, সংগঠন ও বিজয়ের স্মরণে এই দিনটিকে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক–এই দাবি নতুন প্রজন্মের ছাত্ররাজনীতির প্রতি রাষ্ট্রের দায় এবং ইতিহাসের ন্যায্য সম্মান।

এই ইতিহাস কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একক অর্জন নয়, এটি সম্মিলিত ছাত্রশক্তি, তথা গোটা জনগোষ্ঠীর জয়। যারা শহীদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন, যারা নিখোঁজ, যাদের নামে মামলা হয়েছে–তারা প্রত্যেকেই আমাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নির্মাতা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষার্থীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে ১৮ জুলাইকে রাষ্ট্রীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা সময়ের দাবি, ইতিহাসের অনিবার্যতা এবং ছাত্রসমাজের প্রতি আমাদের ন্যূনতম দায়।

১৮ জুলাই–যেদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম ঢাকার রাজপথে সম্মিলিতভাবে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় এবং রাষ্ট্রীয় দমননীতির বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ গড়ে তোলে। ১৮ জুলাই হোক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিরোধ দিবস।